বর্জন সংস্কৃতি

মৈত্রীশ ঘটক ও অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

১

ক্যান্সেল কালচার, যাকে বর্জন সংস্কৃতি, বা আরেকটু হালকা ভাবে বললে বর্জনবাজি বলা যেতে পারে, নতুন কোনো ব্যাপার নয়।[১] যুগে যুগে শিল্প, সংস্কৃতি, বিদ্যাচর্চা, এবং ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয়েছে। কখনো তার লক্ষ্য আপত্তিকর লেখা, শিল্পকর্ম, বা বক্তব্য আবার কখনো তার লক্ষ্য লেখক, শিল্পী বা বক্তার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো দিক যা ধর্ম, মতাদর্শ, বা সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে আপত্তিকর মনে করা হচ্ছে।

বর্জন সংস্কৃতি সেন্সরশিপ বা নিষিদ্ধকরণের থেকে আলাদা কারণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আইনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্জন সংস্কৃতির পরিসর সামাজিক। এতে একধরণের সামাজিক ও নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় পাঠককে কোনো বই না পড়তে বা দর্শককে কোনো চলচ্চিত্র না দেখতে।[২] তবে ঠিকই, এই ধরণের চাপ যখন প্রতিবাদী আন্দোলনের রূপ নেয় বা তার জের আদালত পর্যন্ত গড়ায় তখন সেই বই বা শিল্পকর্ম সেন্সরশিপের আওতায় এসে যেতে পারে, বা নিষিদ্ধও করা হতে পারে। আমাদের আলোচনা মূলত সামাজিক পরিসরে নৈতিক চাপ বা তা নিয়ে বিক্ষোভপ্রদর্শনের ওপরেই মূলত আবদ্ধ রাখবো—সরকারী বা আইনি হস্তক্ষেপের ওপর নয়, তবে বিষয়গুলি অবশ্যই অসম্পর্কিত নয়। অনেক

---

১ ক্যান্সেলের আক্ষরিক প্রতিশব্দ হিসেবে ‘বাতিল’ কথাটাও ব্যবহার করা যেত, তার প্রচলিত প্রয়োগের দিক থেকে দেখলে বর্জন (বা বয়কট) আরো উপযুক্ত মনে হয়।

২ আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বই আর চলচ্চিত্রের উদাহরণ ব্যবহার করব। সবরকম বই (শুধু সাহিত্য নয়) এবং সমস্ত সৃজনশীল শিল্পকর্মের (যেমন, চিত্রকলা, নাটক, সংগীত, নৃত্য, নাটক) ক্ষেত্রেই আমাদের বক্তব্য প্রযোজ্য।

ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা জারি করে অপছেন্দের বই বা শিল্পকর্মের ওপর। আমরা জানি রাষ্ট্রই নিষিদ্ধ করেছিল *ডক্টর জিভাগো* বা *স্যাটানিক ভার্সেস* এর মত বই, রাষ্ট্রের অঙ্গুলিহেলনেই জেলে যেতে হয়েছিল জাফর পনাহির মত পরিচালককে। কিন্তু আমাদের আলোচনায় রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ আমরা আনব না। আমরা মূলত কোন গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি সমষ্টির বর্জন সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

ক্যান্সেল কালচার শব্দটি মার্কিন যা এসেছে ক্যান্সেল শব্দের স্বল্পপ্রচলিত একটি ব্যবহার থেকে যার অর্থ সম্পর্কছেদ বা ব্রেক-আপ। এই শব্দের প্রাথমিক ব্যবহার পাওয়া যায় ১৯৮০-৯০ এর দশকের আমেরিকায় জনপ্রিয় গান এবং চলচ্চিত্রে। কারও মতে এর প্রথম ব্যবহার ১৯৯১ এর ছবি *নিউ জ্যাক সিটি* আবার কারো মতে ১৯৮১'র *ইওর লাভ ইস ক্যান্সেলড*-এ। ইন্টারনেটযুগে এই শব্দই ফিরে আসে বৃহত্তর অর্থ নিয়ে যার মানে কোনো লেখক বা শিল্পীর কাজ বা তিনি অংশ নিচ্ছেন এমন কোনো অনুষ্ঠান বা কাজ নৈতিক কারণে বর্জন করার আবেদন। আমরা এই শব্দের বাংলা হিসেবে “বর্জন সংস্কৃতি” শব্দ ব্যবহার করছি।

এই শব্দবন্ধটি বাংলায় নতুন শোনালেও, আমাদের ইতিহাসে এই ধরণের উদাহারণ অজস্র এবং বিভিন্ন মতাদর্শগত অবস্থান থেকে তা এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এসেছে সামাজিক এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতার জায়গা থেকে, যেমন কোনো বই বা শিল্পকর্ম অশ্লীলতার দায়ে বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে বলে অভিযুক্ত হয়েছে। আবার কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বা ঐতিহাসিক চরিত্রের অবমাননা করা হয়েছে সেই জায়গা থেকেও এইধরণের বর্জনকরণের দাবি উঠে এসেছে। তবে মতাদর্শগতভাবে বাম বা প্রগতিশীল পরিসরেও বর্জন সংস্কৃতির অনেক উদাহরণ আছে। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলা বা বিদ্যাসাগরের মূর্তির মাথা কাটা থেকে বামফ্রন্ট আমলে 'অপসংস্কৃতির' ধুয়ো সহজেই মনে করা যায়।

তবে বর্জন সংস্কৃতিতে মতাদর্শ আর শিল্পকর্মের মধ্যে কোনো সরল সম্পর্ক নেই। অনেক সময় সমস্যাটার উৎস প্রত্যক্ষভাবে কোনো বই বা শিল্পকর্ম নয়— কোনো লেখক বা গায়ক বা অভিনেতার সমস্যাজনক কোনো মন্তব্য (যেমন, যা নারীদের বা এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের প্রতি অবমাননাকর) বা আচরণ (যেমন, যৌন হেনস্থার অভিযোগ) থেকেও তাঁর লেখা বই, বা তাঁর নির্দেশিত বা অভিনীত ছবি বা নাটক বয়কট করার দাবি উঠে এসেছে। আবার অনেকসময় কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের কারণে নয়, বিক্ষোভের উৎস কিছু মানুষের অনুভূতিতে আঘাতের কারণে। জনপ্রিয় সংস্কৃতি থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ঘটনাটা বছর তিনেক

আগে ঘটেছিল, কলকাতারই বুকে। জনপ্রিয় গায়ক কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ যিনি কেকে নামে প্রসিদ্ধ সেই সময় কলকাতায় গানের অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে কলকাতার উন্মাদনা দেখে বাঙালি গায়ক রূপঙ্কর সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে বলেন যে এই কেকে উন্মাদনা অর্থহীন কারণ বাংলাতেও বহু বড় মাপের প্রতিভা আছে। সেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে রূপঙ্কর বলেন "হু ইজ কেকে?" যা কেকে ভক্তদের কিছুটা তাতিয়ে দেয়। কিন্তু ধিকি ধিকি জ্বলা সেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে তখন, যখন কলকাতার সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় কেকে'র। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরে ইন্টারনেটের জনরোষ আছড়ে পড়ে রূপঙ্কর এবং তার পরিবারের ওপর। প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েও পার পাননি রূপঙ্কর। তিনি সমাজমাধ্যম থেকে বিরতি নেওয়ার ঘোষণা করেন এবং জানান এই বিতর্কের জেরে তাঁর একাধিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে উদ্যোক্তাদের পক্ষে থেকে। এই বিতর্কের ঠিক-ভুল বিচার আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই ঘটনাটি আমাদের চারপাশে ঘটে চলা বর্জন সংস্কৃতিরই একটি উদাহরণ মাত্র এবং এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কিছুদিন আগে মঞ্চে কন্নড় গান গাইতে না চাওয়ায় একই ভাবে আন্তর্জালিক রোষের মুখে পড়েন জনপ্রিয় গায়ক সোনু নিগম এবং এই বিতর্কের পরিণতিতে তাঁর গাওয়া গান একটি কন্নড় চলচ্চিত্র থেকে বাদও দেওয়া হয়।

এইসব কারণে কখন কোথায় কী নিয়ে বিক্ষোভ জেগে উঠতে পারে তা ঠিকমতো আন্দাজ করা মুশকিল। এই ধরণের ঘটনা যে শুধু রাজ্যে বা দেশে সীমাবদ্ধ তাও নয়। সাম্প্রতিকালে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে তাঁর বক্তব্যের কারণে হ্যারি পটারের লেখিকা জে কে রাওলিং-এর ওপর নেমে এসেছে বর্জন সংস্কৃতির খাঁড়া। পশ্চিমে এই তালিকাটি বেশ দীর্ঘ যার মধ্যে অনেক বিখ্যাত গায়ক, নায়ক এবং লেখকেরই নাম আছে।

কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে বর্জন সংস্কৃতি ইন্টারনেট এবং সমাজমাধ্যমের অবদান। বর্জন সংস্কৃতির মূল যে ধারণাটি, অর্থাৎ কারো দার্শনিক বা রাজনৈতিক অবস্থান পছন্দ না হওয়ার কারণে কোন লেখক বা শিল্পীকে বয়কট করা, তার ইতিহাস কিন্তু অনেক প্রাচীন। অনেকের মত এই সংস্কৃতি বিদ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথকেও যখন তিনি চীন সফরে যান ১৯২৪-এ। শঙ্খ ঘোষের লেখায় পাই সেই প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা, "কিন্তু এইবার, ১৯২৪ সালের এই প্রবীণ বয়সে, তাঁকে সইতে হলো বেশ বড়োরকমের প্রত্যাখ্যান, চীনা ভাবুক এবং যুবকদের সকলেই খুব সহজভাবে মানতে পারলেন না তাঁকে, খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল অনেকের প্রতিবাদের আচরণ। অনেকেই মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ এখানে বিস্তার করতে

এসেছেন এক হিন্দু ছলা, প্রগতির পরিপন্থী এক কর্মহীনতার বাণী, ঐতিহ্যবিলাস, কেউ কেউ এর মধ্যে সংগোপন সাম্রাজ্যিক চক্রান্তও পেলেন খুঁজে। তরুণ মাও-সে-তুঙ্গের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা সাবধান করে দিলেন অল্পবয়সীদের, সরাসরি জানিয়ে দিলেন এই নবকীর্তিত 'প্রাচ্য সভ্যতা'র কিছুই তাঁরা চান না। এমনই প্রকাশ্য হয়ে দাঁড়াল কোন কোন বিদ্রোহ বা অসহযোগ যে খানিকটা থমকে গেলেন কবি, এমন-কী বাতিল করে দিতে হলো তাঁর পূর্বঘোষিত কয়েকদিনের সভা”।[৩] এর সঙ্গে যদি মিলিয়ে ভাবা যায় রাষ্ট্রীয় নিষিদ্ধকরণের ইতিহাস তাহলে শিল্পী, লেখক বা বৈজ্ঞানিকদের নিষিদ্ধ বা বর্জন করার ইতিহাস বহু প্রাচীন এবং তার নজির ছড়িয়ে আছে সব দেশে ও কালে।

এখানে তাই আমাদের প্রবন্ধের প্রসারকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। আগেই বলেছি যে আমরা রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা আমাদের আলোচনায় আনব না। আমরা মূলত সাধারণ জনগণ যেভাবে বর্জন সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ করেন সেটাই আমাদের বিশ্লেষণে রাখব। আমরা মূলত দুটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। বর্জন সংস্কৃতির মূলে একধরণের বেসরকারি সেন্সরশিপ রয়েছে। সেই সেন্সরশিপ দক্ষিণপন্থীও হতে পারে আবার বামপন্থীও হতে পারে। আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল, একজন যুক্তিবাদী এবং উদারপন্থী ভাবনার মানুষ কি কোন ধরণের বর্জন সংস্কৃতির সমর্থক হতে পারেন এবং হলে কখন এবং কেন? আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরেকটু সহজ। ইতিহাস ঘাঁটলেই বোঝা যায় যে বর্জন সংস্কৃতি কোন নতুন ভাবনা নয়। কিন্তু আন্তর্জাল এবং সমাজমাধ্যমের যুগে এসে কি বর্জন সংস্কৃতির কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে, না কি যা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই সেটি শুধুই পরিমাণগত?

২

একদিক থেকে ভাবলে এই বর্জন সংস্কৃতির ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। আমি নিজের সময়ে নিজের খরচে নিজের বাড়িতে বসে কী বই পড়বো তা নিয়ে পরচর্চাপ্রবণ প্রতিবেশীর বা পরিচিতমহলে কৌতূহল থাকতে পারে, কিন্তু কারো কিছু তো বলার থাকেনা। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের মূল কথাই হলো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রণীত "no harm principle" যাকে "অক্ষতি-নীতি" বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, আপনি যা খুশি করতে পারেন, যতক্ষণ তা আমার কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষতি করছে না তা নিয়ে আমার মতামত থাকতে পারে, কিন্তু আপনাকে সেটা না করতে বলার অধিকার আমার নেই।

---

৩ পৃ. ২৩, *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ*, শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং।

তার মানে এই নয় যে আমাদের পছন্দ-অপছন্দ একান্তই ব্যক্তিগত। মানুষ সামাজিক জীব এবং আমাদের পছন্দ-অপছন্দ যেভাবে গড়ে ওঠে তাতে সামাজিক প্রভাব অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে পারে এমন মানুষ কমই আছে। আমরা কী বই পড়ি বা কী ধরণের সাংস্কৃতিক পরিসরে বিচরণ করি তার ওপর সামাজিক প্রভাব এমনকি এক ধরনের চাপও কাজ করতে পারে। যেমন, কলেজে ভর্তি হবার আগে এক সময়ে কাম্যু-কাফকা-সার্ত্র পড়া আবশ্যক ছিল। এবং উল্টোটাও সত্যি—যদি ভুলেও বলে ফেলতেন যে আপনি কোনো জনপ্রিয় হিন্দী বা বাংলা ছবি দেখেছেন, বা কোনো জনপ্রিয় আধুনিক গান আপনার খুব প্রিয়, তাহলে সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের তকমা জুটতো না। বরং যে ফেস্টিভালে গিয়ে ফরাসী আর্ট ফিল্ম দেখে বা ডোভার লেনে রাত জেগে ধ্রুপদী সংগীত শোনে বা মোৎসার্টের ভক্ত, সে তৎক্ষণাৎ সামাজিক পাত্তার নিরিখে আপনাকে অনায়াসে পেছনে ফেলে দিত। এর একটা ফল ভালো—সামাজিক অনুমোদন পেতে গিয়ে কষ্ট করে বিশ্বসাহিত্যের কিছু ক্লাসিক্স পড়ে ফেললেন এবং তার কিছু হয়তো আপনার খুব ভালো লেগে গেলো। আর একটা ফল খারাপ—আপনার প্রিয় কিন্তু সংস্কৃতিবান মহলে সাধারণ বা নিম্নমার্গের মনে করা হয় এরকম জিনিস আপনাকে একটু লুকিয়ে উপভোগ করতে হবে। তবে ব্যাপারটা শুধু এইটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে হয়তো ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্ব দাবি করেনা।

সমস্যা তাহলে কোথায়? আমাদের অন্যান্য যে প্রয়োজন—যার মধ্যে ভালো কোনো রেস্তোরাঁ বা দোকানপাট বা মোবাইল ফোনের মডেলের সন্ধান আছে—সেখানে উৎকর্ষ বা আমাদের পছন্দ বা প্রয়োজন বিচার করা সোজা এবং সেই বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে একটা মোটামুটি বস্তুগত মূল্যায়ন করা শক্ত না। এখন তো আন্তর্জালে কোনো কিছুর ফরমাস দিতে হলেই অন্যান্য ভোক্তার মতামত থেকে একটা গড় মূল্যায়ন পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, এই পরিসরে নানা বাণিজ্যিক সংস্থার পণ্য ও পরিষেবা বয়কট করার আহ্বানও আসে। দেশে বিদেশে পণ্য বয়কটের ইতিহাস দীর্ঘ, যার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনও পড়ে। সাম্প্রতিককালে এর উদাহরণ হলো কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা যদি শিশুশ্রম ব্যবহার করে বা তার সম্পর্কে অন্যরকম অভিযোগ ওঠে (যেমন, পরিবেশদূষণ বা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি না দেওয়া বা কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা) ভোক্তাদের কাছে তাদের পণ্য বয়কট করার আবেদন। এই দিক থেকে বর্জন সংস্কৃতির সাথে মিল থাকলেও সাধারণ কোনো ভোগ্যপণ্য এবং বৌদ্ধিক-নান্দনিক চর্চার জগৎটার একটা মৌলিক তফাৎ আছে। শিল্প-সাহিত্য-

সংস্কৃতির পরিসরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির একটা বড়ো ভূমিকা আছে – আমরা এখানে পাঠক বা দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে যা আহরণ করি তা আত্মগত, নৈর্ব্যক্তিক নয়। আর তাই এখানে উৎকর্ষের কোনো নির্দিষ্ট বা বস্তুনিষ্ঠ মাপকাঠি নেই।

এখন ঠিকই, কোনো সাধারণ ভোগ্যদ্রব্য যা আপাতভাবে বস্তুগত, তারও উৎকর্ষের বিভিন্ন দিক থাকতে পারে। যেমন অনেক জিনিস উপযোগিতার দিক থেকে ভালো হলেও টেকসই নয়। তাহলেও এই বিভিন্ন দিকগুলোর আলাদা করে একটা মোটামুটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করা সম্ভব এবং সেখানে দুজন মানুষের মধ্যে পছন্দ আলাদা হলেও জিনিসটির মান নিয়ে মতভেদ থাকবেনা। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে এ দিক থেকেও একটা মৌলিক তফাৎ আছে। আমাদের জীবনস্রোত এবং চিন্তাভাবনার জগৎ পরিবর্তনশীল, আজ যা ভালো লাগেনি, পরে তা ভালো লাগতে পারে। তাই আমাদের পছন্দ-অপছন্দগুলো শুধু আত্মগত নয়, তার নির্দিষ্ট স্থির কোনো মানচিত্র নেই। তাই আমার কি ভালো লাগবে জানতে গেলে খানিকটা নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া দিকনির্দেশ ছাড়া সম্ভব নয়, কারণ নিজেকে এবং জগৎকে আক্ষরিকভাবেই "জানার কোনো শেষ নেই"।

এখানে অর্থনীতির জগতে একটা ধারণা আছে যা আমাদের আলোচনার জন্যে প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন ধরণের পণ্যের যে শ্রেণীবিভাগ আছে, তার একটা হলো "experience goods" (অভিজ্ঞতানির্ভর পণ্য)। এগুলো হলো সেই ধরণের পণ্য যাদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া আমাদের ভালোমন্দ বিচার করা মুশকিল। সে ক্ষেত্রে অন্যদের মতামতের বা মূল্যায়নের ভূমিকা খুব গুরুত্তপূর্ণ। সাহিত্য ও শিল্পকর্ম এর খুব ভালো উদাহরণ। বিদগ্ধ সমালোচকেরা বা আমাদের নিজস্ব সামাজিক বৃত্তে যাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাঁরা বর্তমান জমানার একটা শব্দ ব্যবহার করে বলতে গেলে "influencer" বা প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেন। আমি যদি না জানি আমার কী কী ভালো লাগতে পারে এবং বর্জন সংস্কৃতির কারণে কিছু বই বা শিল্পকর্মের আলোচনাই না হয়, তাহলে কিন্তু আমার একটা বড়ো ক্ষতি হলো—আমি জানতেও পারলাম না আমি কি পেলামনা। একনায়কতন্ত্রে এটা রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে জোর করে করা হয়, কিন্তু বর্জন সংস্কৃতির মধ্যেও সেই প্রবণতা আছে যদিও তা ব্যক্তিগত বা সামাজিক উদ্যোগে করা হয়। কোনো লেখক বা শিল্পীর (বৃহত্তর অর্থে) প্রতি যদি বীতরাগ তৈরী হয় এবং নিজে যাচাই না করে আমি তাকে এড়িয়ে যাই, তাহলে সেটা একটা বড়ো ক্ষতি।

এবার প্রশ্ন হলো, বর্জন সংস্কৃতি আমায় কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যদি আমি যুক্তিনির্ভর এবং মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী হই? অর্থাৎ, লেখক বা শিল্পীর জীবন বা নানা বিষয়ে মতামত যদি আমার মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণ না মেলে, আমি কি তাঁদের বয়কট করবো? বা না করলেও, আমার পাঠক বা দর্শক হিসেবে মূল্যায়নে কি সেগুলোর খানিকটা প্রভাব পড়বে, না কি আমি সাহিত্যিক বা শৈল্পিক উৎকর্ষের দিকেই শুধু নজর দেব? আমরা যদি বিজ্ঞানের জগতের সাথে তুলনা করি, সেখানে একজনের অবদানের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন সম্ভব এবং তাঁর কাজ যদি আমার জন্যে প্রাসঙ্গিক হয়, তা তাঁর সামাজিক বা রাজনৈতিক বক্তব্যের কারণে না ব্যবহার করা অযৌক্তিক হবে। শিল্প, সাহিত্য এবং বৌদ্ধিক জগতের ক্ষেত্রেও খানিকটা তাই— বাংলা সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক হলে তাঁর সমস্যাজনক সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামতের সাথে মতভেদের কারণে বঙ্কিমচন্দ্র না পড়লে নিজের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। কিন্তু যদি সেই সাহিত্য বা শিল্পকর্মের এমন কোনো দিক থাকে যা আমার মূল্যবোধকে প্রবল আঘাত করে—যেমন, ঔপনিবেশিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, দাসপ্রথা, জাতিভেদপ্রথা বা পুরুষতন্ত্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন—তাহলে সব পাঠকের পক্ষে তার নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় এবং নেহাতই বাধ্য না হলে (যেমন, সিলেবাসে থাকা) না পড়তে বা না দেখতে ইচ্ছে হওয়াটা অযৌক্তিক নয়।

তাহলেও, বর্জন সংস্কৃতির সমস্যা হলো, এই বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই কোনো কিছুকে অচ্ছুৎ সাব্যস্ত করা এবং সেই রেখা অতিক্রম করলে একঘরে হবার প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ ঝুঁকি। কেউ কী পড়বেন না বা দেখবেন না সেটা তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত, কিন্তু অন্যদেরও সেই মত মেনে নিতে হবে, এই জোর ফলানোটা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। বর্জনকারীরা হয়তো বলতে পারেন যে তাঁরা কাউকে বাধ্য করছেন না। কিন্তু তাহলেও এঁদের সাথে একমত না হলে সামাজিকভাবে একঘরে হওয়ার যে ঝুঁকি আছে তার একটা কারণ হলো প্রতিক্রিয়াশীল বা রাজনৈতিকভাবে সন্দেহভাজন হিসাবে অভিহিত হওয়ার ঝুঁকি— আপনি যদি বয়কটকে সমর্থন না করেন তবে আপনি আসলে বর্জনকারীরা যে আপত্তিকর কাজ বা মূল্যবোধগুলি তুলে ধরছেন তা সমর্থন করছেন। এর ফলে এই বিষয়ে যুক্তিনির্ভর এবং নীতিনিষ্ঠ মতামত থাকলেও অনেকেই চুপ করে যাবেন। এতে কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পরিসর খুব সীমিত হয়ে যাবে এবং সেটা দুর্ভাগ্যজনক। বিরুদ্ধযুক্তি ভালো করে শুনলে এবং তার মোকাবিলা করলে প্রতিবাদকারীদের নিজেদের বক্তব্য আরো প্রত্যয়জনক হবে। আর, যুক্তি, তর্ক, ও আলোচনার মাধ্যমেই কোনো বিষয়ে একটা ঐকমত্য গড়ে তোলা সম্ভব। তাই

আমরা রাষ্ট্রের হাতে কোনো কিছুকে অচ্ছুৎ সাব্যস্ত করার ক্ষমতা না দিতে চাইলে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দেব কেন?

৩

একথা আগেই আলোচনা করেছি যে বর্জন সংস্কৃতির ইতিহাস খুব নতুন কিছু নয়। তবু ইন্টারনেট প্রযুক্তি যেভাবে সমাজমাধ্যম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারপরে বর্জন সংস্কৃতি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সেই পরিবর্তন পরিমাণগত তো বটেই, কিন্তু একই সঙ্গে তা গুণগতও। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বা নৈতিক দর্শনের সঙ্গে কোন শিল্পীর জীবনচর্যা বা দর্শনের মিল না থাকলে তার শিল্পকর্ম বয়কট এখন অতি প্রচলিত একটি প্রতিবাদের পদ্ধতি। ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেখলে এ কথা মনে হতে পারে যে বর্জন সংস্কৃতি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অস্ত্র বিশেষ। কিন্তু দেখার চোখ কে দেশ এবং কালের মাত্রায় প্রসারিত করলে বোঝা যায় যে বিভিন্ন দেশে, কালে এই অস্ত্রের প্রয়োগ হয়ে এসেছে দলমত নির্বিশেষে—কখনও তা বামপন্থীদের হাতিয়ার, কখনও দক্ষিণপন্থীদের, কখনও তা হিন্দু মৌলবাদীদের অস্ত্র, আবার কখনও বা ইসলামিক মৌলবাদীদের। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সমাজমাধ্যম এবং ইন্টারনেট বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ পদ্ধতিতে এক সার্বিক পরিবর্তন এসেছে।

ইন্টারনেট যুগে বর্জন সংস্কৃতির প্রথম যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা হল পদ্ধতির পরিবর্তন। আগে অপছন্দের কোন শিল্পকর্ম বর্জন করার উপায় ছিল রাস্তায় নেমে আন্দোলন যা অনেকাংশেই হিংসাত্মক এবং যার মূল পদ্ধতিটি ছিল জনগণকে সেই শিল্পটি উপভোগ করার থেকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে আটকানো। আশির দশকে কলকাতায় বামপন্থীদের *র‍্যাম্বো* ছবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ (কারণ তা ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ভিয়েতনামের ভূমিকা নিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল) বা সাম্প্রতিককালে *পদ্মাবত* ছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে হল ভাঙচুর এই গোত্রভুক্ত। সাম্প্রতিক অতীতে এই ধরণের প্রতিবাদের অতি-হিংসাত্মক রূপ দেখা গেছিল ২০০৭ সালের কলকাতায় তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, যা থামানোর জন্য সেনা পর্যন্ত তলব করতে হয়।[৪] বর্তমানের ইন্টারনেট যুগের বর্জন সংস্কৃতির ধরন অনেকটাই আলাদা। আগের পদ্ধতিটি যদি কোন বিশেষ সংস্কৃতির যোগান আটকানোর চেষ্টা করে, তাহলে নতুন পদ্ধতিতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয় চাহিদা—বর্জনের স্বপক্ষে প্রচারের মাধ্যমে।

---

৪ বিবিসি ওয়েবসাইটে ২১ নভেম্বর, ২০০৭ ‘‘Army deployed after Calcutta riot’’ নামক সংবাদ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আগের বর্জন সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান বর্জন সংস্কৃতির পার্থক্য যে শুধু চাহিদা আর যোগানকে প্রভাবিত করার পার্থক্য—তা নয়। সমাজমাধ্যম এসে আন্তর্জাল প্রযুক্তির হাত ধরে বর্জন সংস্কৃতিতে দুটো বড়সর পরিবর্তন এনেছে ।

এক, বর্জন করার আহ্বান জানানোর ব্যয় কমে গেছে অনেকটাই। আগের যুগে বর্জন করার ডাক দেওয়ার উপায় ছিল সভাসমিতির আয়োজন, লিফলেট বিতরণ কিংবা নিদেন পক্ষে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা। এর প্রত্যেকটিই পরিশ্রমসাধ্য এবং এর মাধ্যমে অনেক লোকের কাছে পৌঁছনর কাজটিও বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। আন্তর্জাল এবং সমাজমাধ্যম এসে এই ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। পুরনো ব্যবস্থায় হাজার লোককে লিফলেট দিতে গেলে কয়েকজন লোকের হয়ত এক বা দুদিন লেগে যেত, সেখানে সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নেওয়া বার্তা কয়েক মিনিটেই কয়েক লাখ লোকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু তারপরেও বর্জন সংস্কৃতিকে কার্যকর করার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। বই পোড়ানো বা সিনেমা হল ভাঙচুরের ক্ষেত্রে ব্যয় যাই হোক না কেন, তার কার্যকারিতার কারণ সহজবোধ্য—হাঙ্গামার ভয়ে সিনেমা হল মালিকরা সেই সিনেমা চালাবেন না বা বই বিক্রেতারা সেই বই বিক্রি করবেন না।

দুই, সমাজমাধ্যম কিভাবে বর্জন সংস্কৃতিকে পালটে দিয়েছে তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এখন সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করার পদ্ধতিটিও পাল্টে গেছে। সমাজমাধ্যমে বর্জনের ডাক শুনে সাধারণ মানুষ কেন সেই বই বা সিনেমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন তার কারণটা ভেবে দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে আমাদের সহায়ক হতে পারে একটি প্রাচীন রীতির আলোচনা। ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে বয়কটের মাধ্যমে কাউকে শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতিটি খুব অভিনব কিছু নয়। হয়ত আধুনিক নগর জীবনে তার প্রয়োগের মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে। গ্রাম সমাজে এই বয়কটের একটি নাম আছে—ধোপা-নাপিত বন্ধ বা একঘরে করা। নামের মধ্যেই এই পদ্ধতির একটি আভাস আছে। এই ব্যবস্থায় যাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তার থেকে গ্রামের বাকি লোকেরা কোন জিনিস কেনেন না বা তাকে কোন পণ্য বা পরিষেবা বিক্রিও করেন না। কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রামের আবদ্ধ সংস্কৃতিতে যতটা কার্যকরী, শহরের মুক্ত পণ্যের বাজারে তা নয়। শহরের বাজার অনেক বড়। কোন একটি পাড়ার লোক কাউকে বয়কট করলেও, তিনি শহরের অন্য প্রান্তে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, সেখান থেকেই তাঁর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু গ্রামের মধ্যেও এই বয়কট কার্যকরী করা সহজ না। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।

ধরুন কোনো একটি গ্রামে একটি মুদির দোকান আছে এবং সেটিই গ্রামের সবচেয়ে বড় দোকান। তার মালিক হলেন রামবাবু। এবার তিনি গ্রামের কোন নিয়ম ভাঙ্গায় গ্রামের লোকেরা ঠিক করল তার সাথে কোনো সামাজিক যোগাযোগ রাখবে না। এখন রামবাবুর নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে, কিন্তু গ্রামের লোকেরও অসুবিধেও কম কিছু হবে না। কারণ এখন দরকারি জিনিসপত্র কিনতে তাদের পাশের গ্রামে যেতে হবে। প্রশ্ন হল, গ্রামের লোকেরা এই অসুবিধে মেনেও বয়কট করবে কেন? অর্থনীতির তত্ত্বে এর কোন সহজ উত্তর নেই। একটা সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে যে বয়কটে অংশগ্রহণ করবে না তাকে গ্রামের বাকি লোকেরা বয়কট করবে এবং সেই ভয়ে বাকিরাও এই বয়কটে অংশগ্রহণ করবে। এরকম বয়কট শহরে সফল করা যায় না মূলত দুটো কারণে। এক শহরে অনেক বিক্রেতা থাকেন। কোন পাড়ার লোক বয়কট করলেও কেউ বাইরে থেকে কিনতে পারেন। আর দুনম্বর, পাড়ার কেউ বয়কটে অংশ নিচ্ছে কিনা এটা শহরে খোঁজ রাখা কঠিন তাই শাস্তির বাস্তবায়নও কঠিন।

এই একই প্রশ্ন বর্জন সংস্কৃতির জন্যও সত্যি। ধরা যাক, কেউ কোন এক শিল্পীকে বর্জন করার ডাক দিলেন। প্রশ্ন হল সবাই সেই ডাকে সাড়া দেবেন কেন? কিছু কিছু মানুষ নিশ্চয়ই মতাদর্শগত ভাবে ওই শিল্পীর বক্তব্যের বিরোধী। কিন্তু বাস্তবত বর্জন সংস্কৃতি সফল করতে হলে আরো বহু মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ লাগে যাঁদের হয়ত সেরকম কোন মতাদর্শগত অবস্থান নেই। তাহলে তাঁরা কেন এতে অংশগ্রহণ করেন? কারণ সমাজমাধ্যমের যুগে কে কী করছেন তা প্রতিমুহূর্তে সর্বসমক্ষে এসে যাচ্ছে। তাই বয়কট কর্মসূচীতে অংশ না নিলে অন্যদের চোখে আপনি শিল্পীর সমর্থক প্রতিপন্ন হতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে সমাজ আপনার ওপরেও ট্রোলের খাঁড়া নামিয়ে আনতে পারে। তাই সমাজমাধ্যমের উপস্থিতিতে যিনি আসলে নিরপেক্ষ তিনিও বয়কটে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

এখন প্রশ্ন হল সমাজমাধ্যমের যুগে বয়কটের যে নতুন ভারসাম্য বিন্দু তা পুরোন ভারসাম্য বিন্দুর থেকে কতটা আলাদা? প্রাক-সমাজমাধ্যম যুগে যে বয়কট হত তা হত কোন সংগঠনের সংগঠিত প্রয়াসের মাধ্যমে এবং তা প্রায়ই হত প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আটকে দিয়ে। কিন্তু নতুন পদ্ধতিটি বিকেন্দ্রীকৃত এবং তা অগণিত পাঠক বা দর্শকের কোনো বই পড়া বা চলচ্চিত্র দেখার সিদ্ধান্তকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা হলো ভোক্তাদের চাহিদাকে প্রভাবিত করার উদাহরণ। প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের সুযোগ এখানে কম। ইন্টারনেট এবং সমাজমাধ্যম আসার আগে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না

বললেই চলে। এই দুই পদ্ধতির আরেকটা বড় পার্থক্য হল প্রথম ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে রাষ্ট্র এই বয়কট থামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বিকেন্দ্রীকৃত হওয়ার কারণে সেই পথও বন্ধ। তাই সমস্যাটা গুণগতভাবে আলাদা।

৪

উপরের আলোচনায় আমরা মূলত দুটি বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করেছি। এক, বর্জন সংস্কৃতির পক্ষে বা বিপক্ষে যে সম্ভাব্য যুক্তি থাকতে পারে তা আলোচনা করেছি এবং দুই, আন্তর্জাল এবং সমাজমাধ্যমের যুগে এসে বর্জন সংস্কৃতির যে রূপ বদল তার একটি বিশ্লেষণ রেখেছি। সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ থেকে মনে হতে পারে যে বর্জন সংস্কৃতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির একটি অস্ত্র। কিন্তু আগেই বলেছি, আমাদের উদাহরণমালা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বাম এবং দক্ষিণ উভয় পক্ষই তাদের বিরোধী দর্শনকে কোণঠাসা করার জন্য বর্জন সংস্কৃতি ব্যবহার করেছে। মনে হয় যেন আমাদের সবার মধ্যেই বর্জন সংস্কৃতির বীজ কোথাও না কোথাও রয়ে গিয়েছে। কেউ হয়তো নব্য নাৎসি দর্শনের বিরোধিতা করার জন্য বর্জন সংস্কৃতি ব্যবহার করতে চান আবার কেউ হয়ত ধর্মবিরোধীদের চুপ করানোর জন্য।

কিন্তু কেন এমন হয়? আমরা তো কোন বই বা ছবি ভালো না লাগলে সেটি না দেখলেই পারি। কেন আমরা তাকে বর্জন করার ডাক দিই? কেনই বা আমরা কোন শিল্পকে বিচার করার জন্য শিল্পীর ব্যক্তি জীবন নিয়ে চিন্তা করি? এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া এই পরিসরে সম্ভব না। তবু আমরা চেষ্টা করব কিছু সম্ভাব্য ভাবনাসূত্র রেখে যাওয়ার।

কোন শিল্পকে আমরা যদি পণ্য ভাবি এবং নিজেদের উপভোক্তা, তাহলে অর্থশাস্ত্র বলবে শিল্প থেকে উপযোগ (utility) পাওয়া বা না পাওয়া—কোনো বই পড়ে বা কোনো চলচ্চিত্র দেখে ভালো লাগা বা না লাগার সঙ্গেই তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ। আমরা জানি কোন বই বা ছবি থেকে কী উপযোগ পাওয়া যেতে পারে এবং সেই বিচারে আমরা সেই বইটি কিনি বা ছবিটি দেখতে সিনেমা হলে যাই। কিন্তু সম্ভবত এই সম্পর্ক এখানেই শেষ নয়। যেকোন শিল্পী বা শিল্পকর্ম সমাজে রোল মডেলের কাজ করে। অর্থাৎ, শিল্পকর্মের মূল বক্তব্য অথবা শিল্পীর জীবনশৈলী কোন একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক আদর্শ প্রচার করে। যেমন ধরা যাক সত্তর দশকের রক গায়কদের বা বীট কবিদের অনেকেই বিভিন্ন নেশায় আসক্ত ছিলেন। এই শিল্পীরা এবং তাদের অনেক ভক্তরা তাদের মাদকের ব্যবহারকে সামাজিক

রীতিনীতির বিরুদ্ধে তাদের বৃহত্তর বিদ্রোহের অংশ হিসাবে দেখেছিল। তাই তাঁদের জীবনচর্যা অনেক তরুণকেই নেশার দিকে ঠেলে দিয়েছে এরকম অভিযোগ শোনা যায়। সুতরাং মানুষ যখন বর্জন সংস্কৃতি ব্যবহার করেন তাঁরা সম্ভবত কোন শিল্পকর্ম দেখা, শোনা বা পড়াকে শুধুমাত্র একটি পণ্য উপভোগ হিসেবে ভাবেন না। তাঁরা কোন শিল্পকর্ম ক্রয়কে সেই শিল্পীর সামাজিক মতাদর্শকে সমর্থন করার সঙ্গে এক করা দেখেন এবং যদি সেই মতাদর্শের তাঁরা বিরোধী হন তাহলে শুধুমাত্র নিজে তা পড়া বা দেখা থেকে বিরত থাকেন তা নয়, অন্যকেও সেটি পড়তে বা দেখতে বাধা দেন। সেই বাধা কখনও সমাজমাধ্যমে ট্রোল করার মাধ্যমে হতে পারে আবার কখনো রাস্তায় নেমে বই বা শিল্পীর কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর মাধ্যমেও হতে পারে। ইন্টারনেট এসে যাওয়ার পরে অনেক বেশি লোকের পক্ষে এই সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ সহজ হয়েছে।

তাহলে বর্জন সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের মূল বক্তব্যটা কী? আমরা আলোচনা করেছি কেন বর্জন সংস্কৃতিকে ভালো বা খারাপের দ্বৈতছন্দে বাঁধা কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে আমরা বর্জন সংস্কৃতি কার্যকরী করার জন্য জোরজবরদস্তির বিরোধী। তা শুধু হিংসাত্মক ঘটনা বা শারীরিক আক্রমণ নয়, ইন্টারনেটের যুগে ট্রোলিংও কিন্তু হিংসারই রকম ফের। কোন বিষয় নিয়ে পছন্দ-অপছন্দ থাকবেই। সেই অপছন্দ লিখিত বা মৌখিক ভাবে ব্যক্ত করাতেও ভুল কিছু নেই। কিন্তু যে কোনো আন্দোলনের একটা রেখা আছে যা অতিক্রম করাটা গণতন্ত্রের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শের পরিপন্থী।

শুধু নৈতিক দিক থেকে নয়—এর স্বপক্ষে একটা ব্যবহারিক যুক্তিও আছে। রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে থাকলে একধরণের অসহিষ্ণু মনোভাব বাম-মধ্য-দক্ষিণ সব মতাদর্শের দল বা তাদের সমর্থকদের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু তা না হলে ব্যক্তি হিসেবে যাঁরা প্রগতিশীল এবং উদারপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, বিষয় যাই হোক না কেন, শেষ বিচারে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কী ন্যায্য বা কী অন্যায্য এই নীতির ওপর তাঁরা জোর দেন বেশি।[৫] তুলনায় দক্ষিণপন্থী বা রক্ষণশীল মতাদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের মূল চালিকাশক্তি হলো কোনো গোষ্ঠীর সমষ্টিগত স্বার্থকে রক্ষা করা। তাই তাঁদের কাছে ন্যায্য হলো যা সেই গোষ্ঠীর জন্যে ভালো বা ন্যায্য—তার জন্যে অন্যদের ওপর

৫ এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তাঁদের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারার মানুষ আছেন আবার ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী উদারপন্থীরাও আছেন। তাঁরা সব বিষয়ে একমত না হলেও এখানে তাদের একত্র করার কারণ কিছু বিষয়ে—যেমন, বিভিন্ন প্রান্তিক বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার—নিয়ে তাঁরা আপাতভাবে একমত।

জোরজবরদস্তি করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা পিছপা নন। প্রগতিশীল এবং উদারপন্থী শক্তিগুলোও সেই একই পন্থা অবলম্বন করলে, আখেরে কাদের হাত শক্ত করা হবে? কারা বলবে—আর তোমরা যখন করো, তার বেলা?

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মনীষিতা দাশ লেখাটির প্রাথমিক খসড়া পড়ে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন।]